প্রবন্ধ

শিক্ষক দেয় জ্ঞানের আলো
স্রষ্টা ফোটায় ফুল
সেই ফুলেরই সুবাস নিতে
করো না কেউ ভুল।

আবেগ মোটেও নয় মন্দ
জ্ঞান-গরিমায় ভরা প্রবন্ধ।
প্রবন্ধের স্বাদ পেতে
এসো আমার সাথে;
একটু মনোযোগ দাও
প্রবন্ধের ঘরে যাও।।

- মোছাঃ আফরোজা পারভীন
সহকারী শিক্ষিকা (প্রভাতি)

সাদিয়া ইসলাম অরিন
শ্রেণি- ৮ম, শাখা- খ (প্রভাতি)

প্রবন্ধ

বই পড়া এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

ফারহানা আক্তার
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ২৯, বিভাগ : বিজ্ঞান
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

বই হলো সুবিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার। আর এই জ্ঞান হলো কিছু বিষয়ের সবকিছু জানা এবং সব বিষয়ের কিছু কিছু জানা। জ্ঞানের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। জ্ঞানের উৎস বইয়ের মাধ্যমে আমরা অজ্ঞাত ও গৃহীত মনোজগতে প্রবেশ করতে পারি। এই বইয়ের মধ্যে থেকে অসীম মনোজগতে প্রবেশের নির্দেশনা। বই পড়া শুধু পড়ার জন্য নয়। বই পড়ার প্রকৃত অর্থ হলো জীবনের জন্য কিছু সঞ্চয় করা আর মানব জীবনের কিছু অজ্ঞতা লাঘব করা। বই পড়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, একইভাবে পড়ে তা মনে রাখা আরও বেশি জরুরি। বই আমরা সবাই কমবেশি পড়ে থাকি। মানব জীবনে যারা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন তাদের জীবন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তারা বই পড়তেন এবং বইয়ের কাছে তাঁরা কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করেছেন। যেমন : *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জর্জ ওয়াশিংটন* প্রমুখ ব্যক্তিগন। কিন্তু আমরা সবাই বই পড়ি। তাহলে আমাদের মনে কোনোদিন প্রশ্ন উঠেছে বা জেগেছে যে কেন বই পড়ি? বই কেন পড়ব এর কয়েকটি কারণ নিচে দেওয়া হলো :

নতুন কিছু আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে :

আমরা বিভিন্ন নতুন স্থানে ঘুরতে গিয়ে আমরা সেই স্থানের পাশাপাশি নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশ ইত্যাদির সাথে পরিচিত লাভ করি। তদ্রূপ, বই পড়ার মাধ্যমে আমরা পরিচিত হই আমাদের অবচেতন মনোজগতের সাথে, যে জগৎ আমাদের দান করে নতুন আলো, নতুন তথ্য, জ্ঞান ও নবজীবনের পথ।

আত্ম-উন্নয়নের জন্য :

গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন , 'Know yourself' অর্থাৎ 'নিজেকে জানার চেষ্টা' করতে হবে আত্ম-উন্নয়নের জন্য। আর নিজেকে জানতে হলে বই পড়ার বিকল্প নেই। বই পড়ার মাধ্যমে আমরা গোটা বিশ্বকে জানতে পারি।

বুঝবার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য :

কোনো গাড়ি চালাতে হলে আগে বুঝতে হয় কীভাবে গাড়ি চলে বা চালায়। তাই কোনো কিছু জানতে হলে আগে বুঝে নিতে হয় আমি আসলে কি করতে চাচ্ছি। আর বুঝবার জন্য উপযোগী করতে সাহায্য করবে বই।

মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী থেকে শিক্ষা

কথিত আছে, 'Life is short but art is long.' অথচ এই সংক্ষিপ্ত জীবনে কত কিছু করতে হয়। জীবনে ভুল করে, ভুল থেকে শিক্ষা লাভ করে জীবন যুদ্ধে যাঁরা বিজয়ী হয়েছেন তাঁরা আজ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। বই পড়ার মাধ্যমেই এই সমস্ত মহান ব্যক্তিদের জীবন, জীবন সংগ্রাম, জীবন অভিজ্ঞতা, ভুলভ্রান্তি ও উত্তরণ সম্পর্কে জানতে পারি এবং জীবনের জন্য শিক্ষা নিয়ে জীবন স্বপ্নের কাঙ্ক্ষিত চূড়ায় আরোহণ করতে সমর্থ হই।

যোগাযোগের মাধ্যমে হিসেবে

বই আমাদের নিজ মনোজগতের সাথে বর্হিজগতের একটি সেতু বন্ধন তৈরি করে। ফলে আমরা ঘরে বসেই বিশ্ব জগতের আরো খবর পেয়ে থাকি। বই আমাদেরকে বর্হিবিশ্বের সাথে সংযুক্ত করে।

কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি ও সৃজনশীলতা

মাকড়সার জাল আমরা সবাই দেখেছি নিশ্চয়ই। অনেকগুলো সুতোর সাহায্যের তৈরি হয় সে জাল। তেমনিভাবে আমাদেরকে অনেক কিছুর সমন্বয় সাধন করে এর বিস্তার করতে সাহায্য করে বই। যা আগে জানতাম তা বই পড়ে আরো বেশি জানতে পারি এবং বুঝতে শিখি ভিন্ন ভিন্ন কাজ কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন ফল বয়ে আনে।

দুশ্চিন্তা রোধ করে

২০০৯ সালে এক জরিপে বলা হয় যে, যারা প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ৬ মিনিট বই পড়ে তাদের ৬৮% দুশ্চিন্তার মাত্রা কমে আসে। কারণ যখন বই পড়ি তখন আমরা একটি গভীর চিন্তার মধ্যে থাকি ফলে অন্য যতসব সমস্যা, চিন্তাভাবনা মাথায় আসে না। তাই বই পড়া একান্ত আবশ্যক।

এছাড়াও আরো কতগুলা উপকারিতা আছে বই পড়ায় যেমন :

- **স্মৃতি শক্তির উন্নতি সাধন করে।**
- **জীবন গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।**
- **শব্দ ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে।**
- **ভালো লেখক হতে সহায়তা দান করে।**
- **কর্ম জীবনে সর্বাপেক্ষা অগ্রসরতা দান করে।**

প্রবন্ধ
‘হতাশা’ নিয়ে হতাশা

ফারিহা কামাল
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ০২
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে যে আমাদের মতো বয়সের বাচ্চাদের সোজা বাংলায় স্টুডেন্টদের কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়; তাহলে আমি কিছু না ভেবেই বলব, সেটা হলো হতাশা। উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। পড়াশোনা ভালো লাগে না, তাই আমরা বাধ্য হয়ে পড়তে পড়তে এক সময় হতাশ হয়ে যাই। মা-বাবা আমাদের কষ্ট বোঝে না বলে আমরা হতাশ হয়ে যাই। মাথায় গামছা বেঁধে পড়াশোনা করার পর যখন পরীক্ষায় কিছুই কমন পড়ে না, তখন আমরা হতাশ হয়ে যাই, ভালো পরীক্ষা দিয়েও যখন ভালো নম্বর পাই না, এক মার্কের জন্য যখন A^+ ছুটে যায়, পেটভরে যখন টিচারের বকুনি খাই, যখন অঙ্ক মেলে না, যখন অল্পের জন্য টিভি প্রোগ্রাম মিস্ করি। এমনিভাবেই যখন আর্জেন্টিনা (কিংবা ব্রাজিল...) ম্যাচে হেরে যায়, তখনও আমরা হতাশ হয়ে যাই। কথায় কথায় হতাশ হয়ে যাওয়া আমাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আসলেই এই হতাশাটা কী? কেনইবা মানুষ হতাশ হয়। আমাদের Subconscious mind যখন বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমি কিছু পারব না, সবাই আমার চাইতে কোনো না কোনো দিক থেকে এগিয়ে আছে, তখন আমাদের Level of self confidence কমে যায় আর আমরা হতাশ হয়ে যাই।

বাসায় যার মা-বাবা যাকে যত কম সাপোর্ট করবে, সে তত বেশি হতাশ হবে ও হীনম্মন্যতায় ভুগবে। একটা বাচ্চা পরীক্ষায় খারাপ করতেই পারে! পড়াশোনার কথা শুনলে তার মুখ কালো হতেই পারে! তাই বলে যে তার দ্বারা কিছুই হবে না; এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু দুঃখের কথা হলো– অধিকাংশ অভিভাবকের ধারণা ঠিক ওইরকম। যার জন্য আজকালকার বাচ্চারা এত বেশি হতাশ থাকে এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এত কম! কেউ একবার হতাশায় ডুবে গেলে সে একটার পর একটা বিষয় নিয়ে হতাশ হয়েই যেতে থাকে। আমি কাউকে ব্যাপারটা বলতে সে আমাকে বলে দিল, “এটার নাম দিয়ে দাও ‘ডিপ্রেশনের দুষ্টচক্র’” এবং সত্যি বলতে কী, ডিপ্রেশনের এই দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসা সত্যিই অনেক কষ্টকর। একবার এই চক্রের ভেতর যে ঢুকে যায়, সে আর সহজে এটা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। ভয়ানক কথা হলো অনেকে মাঝে মাঝে বুঝতেই পারে না যে সে ডিপ্রেশনে বা হতাশায় ভুগছে। তাই আমি কয়েকটি লক্ষ বলে দিলাম :

১. জগৎ-সংসারের সবকিছুকেই অর্থহীন বলে মনে হতে থাকে; বিশেষ পড়াশোনাকে।

২. বারবার শুধু মনে হয়, ‘কী হবে লেখাপড়া করে? বইয়ের অমুক চ্যাপ্টারটা জীবনের কোনো কাজে লাগবে? ওই অঙ্কগুলো আদৌ কি কোথাও অ্যাপ্লাই করা যাবে?’ ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩. যদি এমন মনে হয় যে বাড়িতে সবাই একটুতেই রেগে গিয়ে তোমাকে কথা শোনাচ্ছে!

৪. মনে মনে এমন চিন্তা যদি আসে, ‘পালাই বহুদূরে, ক্লান্ত ভবঘুরে, ফিরব ঘরে কোথায় এমন ঘর?’

৫. হঠাৎ যদি ‘আমাকে আমার মতো থাকতে দাও’ গানটা প্রচণ্ডরকম ভালো লাগতে শুরু করে।

এখনো হয়তো অনেকে বুঝতে পারছে না যে, হতাশা কত ভয়ানক। কারণ, আজ যে হতাশায় ভুগছে কাল হয়তো সে ড্রাগঅ্যাডিক্ট হয়ে পড়তে পরে কিংবা নিজেকে শেষ পর্যন্ত করে দিতে পারে। খেয়াল করে দেখ, যখন কোনো কারণে তোমার খুব বেশি মন খারাপ থাকে তখন আগামীকাল পরীক্ষা থাকলেও সারারাত তুমি পড়তে পারো না কিন্তু! এমন অবস্থায় মা-বাবা যদি বকা দেয় তখন তো সোনায় সোহাগা! আবার, এমনও হতে পারে যে, কোনো একটা ক্লাসে কোনো একজন রাগী টিচার সব স্টুডেন্টকে কোনো প্রশ্ন করলেন। তুমি উঠে দাঁড়িয়ে সাহস করে উত্তর দিলে এবং সেটা ভুল হলো! টিচার তোমাকে ভালোমতো ঝাড়লেন আর ক্লাসের বাকি সবাই গলা ফাটিয়ে হাসল। তুমি কি এরপর আর কখনো ক্লাসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য হাত তোলার আগে কমপক্ষে দশবার ভাববে না? অথচ এরকম হওয়া মোটেই উচিত নয়। আবার ধর, মা তোমাকে কোনো একটা কাজ করতে মানা করার পরও তুমি সেটা করলে আর একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেললে। তখন তুমি যে বকাটা খাও, তাতে তোমার মনে হতেই পারে, ‘বোঝে না কেউতো চিনল না...’। তুমি কি জানো, কারণে-অকারণে আমরা যখন হতাশ হয়ে যাই তখন আমাদের ব্রেইনের ক্ষমতা কত কমে যায়? যে যেত বেশি সময় ধরে ডিপ্রেশনে ভোগে তার ক্রিয়েটিভিটি আর অবজারভেশন পাওয়ার কিন্তু ততই কমে যায়। আস্তে আস্তে তার আত্মবিশ্বাস ভ্যানিশ হয়ে যায়। এক সময় সে এমন একটা স্টেজে চলে যায় যখন তাকে দিয়ে সত্যিই আর কিছু হয় না! তাই সবসময় চেষ্টা করবে হতাশ না হতে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে সত্যিই এমন অনেক ব্যাপার ঘটে যায়, যখন মন খারাপ না করে পারা যায় না। সেক্ষেত্রে ১০-১৫ মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করে ‘all is well’ বলে নিজের কাজে লেগে পড়বে। তোমার যে পড়াটা এখনো বাকি বা যে কাজটা আজকের মধ্যেই করতে হবে সেই কাজটা তো আর যার সাথে তোমার ঝগড়া হয়েছে, সে এসে করে দেবে না! তাই মন খারাপ করা চলবে না। জানো, মা-বাবা যদি পাশে থাকে তাহলে খুব সহজেই মন খারাপ কাটিয়ে ওঠা যায়? দুঃখজনক হলেও সত্যি যে বর্তমানে অভিভাবকদের মধ্যে এই গুণটি কমে আসছে। যদি কখনো এমন হয়, মা-বাবাও তোমাকে সাপোর্ট না করে, তখনো মন খারাপ করবে না। কারণ, একটু পরে হলেও মা-বাবার রাগ পড়ে যাবে আর তুমি অবাক হয়ে দেখবে যে তারা তোমার পাশেই আছে! তাই কোনো অবস্থাতেই হতাশ হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নেবে না। তাতে ক্ষতি তোমারই। কিন্তু যদি কখনো প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে দেখ যে তোমার পাশে সত্যিই কেউ নেই, তখন : “যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে।”

প্রবন্ধ
হযরত ইউনুস (আ.)

মারিয়া আক্তার
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ৩৮
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

হযরত ইউনুস বা যোনাহ (আ.) বিনইয়ামিন উপজাতীয়দের মধ্য থেকে আল্লাহর নবী হিসেবে প্রেরিত হন। বাগদাদের ২৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিম এলাকা মসুলের বিপরীতে তাইগ্রিস নদীর তীরের পুরান শহর নাইনিভের জনগণের কাছে তিনি আগমন করেন। এই শহরটি বিখ্যাত হলেও এটি এক সময় পাপের নগরে পরিণত হয়। ইউনুস (আ.) এখানকার লোকদেরকে পাপের পথ ছেড়ে আল্লাহর পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান। কিন্তু এখানকার লোকগুলো ছিল বড়ই দুষ্টু প্রকৃতির। তারা ইউনুস (আ.) কে নবী হিসেবে মানতে চাইল না। ইউনুস (আ.) এতে বেশ রাগান্বিত হয়ে শহর ছেড়ে চলে গেলেন। যাওয়ার পথে পড়ল এক নদী। নবী একটি জাহাজে চড়ে বসলেন। জাহাজ গভীর পানিতে প্রবেশ করা মাত্র ভয়ঙ্কর ঝড় শুরু হলো। নাবিকেরা ভাবল ইউনুসের কারণেই তারা বিপদের মধ্যে পড়েছে। তাই তারা নবীকে পানিতে ফেলে দিল। আর অমনি নদীর একটি প্রকাণ্ড মাছ এসে ইউনুস (আ.) কে গিলে ফেলল। মাছের পেটে থেকে ইউনুস (আ.) নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন জনগণের ব্যবহারে রাগ করে তার শহর ছেড়ে আসা ঠিক হয়নি। এজন্য ইউনুস (আ.) আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। আল্লাহতায়ালা নবী ইউনুসের দোয়া কবুল করলেন। ফলে ৪০ দিন মাছের পেটে থাকার পর একদিন মাছ নদীর কিনারে এসে ইউনুস (আ.)কে উগড়ে দেয়। এরপর ইউনুস (আ.) আবার নাইনিভ শহরে ফিরে আসেন এবং তাঁর দীন প্রচারের কাজ শুরু করেন। ইউনুস (আ.) দেশ ত্যাগের সময় সেখানে আল্লাহর আযাব নাজিল হয়েছিল। তাই লোকের ইউনুসের উপস্থিতিতে কামনা করেছিল। এবার ইউনুস (আ.)কে ফিরে পেয়ে তারা আনন্দিত হলো এবং তার দীনকে সানন্দে গ্রহণ করল।

সাদিয়া আক্তার, ৮ম (খ), প্রভাতি

ভ্রমণ কাহিনী

মাঝি চলে নাও বেয়ে
হাঁস সাঁতরায় জলে;
সূর্য হাঁসে শাপলা জলে
বাতাসে কাশ দোলে।।

চারিদিকে ছড়িয়ে কত কী
রয়েছে বহু দেখার বাকী।
ভ্রমনে যাও জ্ঞান বাড়াও
প্রকৃতি উদার অকৃপণ
খুশীতে সব করবে দাম
সবাইকে করে আপন।

- মোছাঃ আফরোজা পারভীন
সহকারী শিক্ষিকা (প্রভাতি)

আফরিন মেহরিন
শ্রেণি-৭ম, শাখা-ক (দিবা)

আমার সিলেট ভ্রমণ

সুমাইয়া খান কেমি
শ্রেণি : ৮ম, শাখা : খ
শিফট : প্রভাতি

২০১৭ সালের মার্চের ১৮ তারিখ। আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। PSC পরীক্ষার পর কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয়নি। তাই বাবা ঠিক করলেন সবাইকে সিলেটে ঘুরাতে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ব্যবসার কারণে আমরা মাত্র একদিনই সেখানে ছিলাম। ১৮ তারিখ রাত ১০টায় আমাদের ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু ট্রেনের এসিতে আগুন লেগে যাওয়ার কারণ ট্রেন ছাড়ে ১০:৪৫ মিনিটে। আমরা স্টেশনে যাই ৮:৩০ মিনিটে। কিন্তু স্টেশনে পৌঁছানোর পর দেখলাম মা তার মোবাইলটা বাসায় রেখে চলে এসেছেন। বাবা তাই আবার বাসায় গেল মোবাইলটা আনার জন্য। বাবা এলেন ৯:৩০ মিনিটে। আমরা চারজন ছিলাম। বাবা-মা, আমি ও আমার ছোট ভাই। ঐ দিন ঢাকায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের ট্রেন ছাড়ার পর প্রায় ২ ঘণ্টা জেগেছিলাম। তারপর আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। আমরা এসি কেবিনে ছিলাম তাই আমাদের জানালা বন্ধ ছিল। আমরা সকাল ৫টায় সিলেটে গিয়ে পৌঁছাই। তারপর একটা অটোতে করে আমাদের হোটেলে যাই। আমাদের হোটেলের নাম ছিল আলআরবিয়া। আমরা সকাল ৮টায় নাশতা করতে যাই। ঐখানের খাবার ও পানি পান করতে আমাদের অস্বস্তিবোধ করছিলাম। আমরা ১০টার পরে বের হলাম। প্রথমে শাহজালাল মাজারে গেলাম। সেখানে কবুতরের কাছে গিয়ে তাকে খাওয়ালাম। এরপর মাগুর মাছ দেখলাম। তারপর আমরা গেলাম শাহ্ পরান মাজারে। সেখানে একটা গাছ দেখে আমি খুব অবাক হলাম। গাছের মধ্যে হাজার হাজার লাল ফিতা বাঁধা। মাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। আর এতে মা বলেন, যে অনেকে নাকি মানত করে এবং মনের ইচ্ছা ঔ লাল ফিতার উপর দম করে গাছে বেঁধে রাখেন। আমিও গাছে লাল ফিতা বাঁধলাম। তারপর ঐখান থেকে আমরা অনেক কিছু কিনলাম। তসবিও কিনলাম। তারপর একটা রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খেলাম। তারপর আবার হোটেলে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। আমরা ভেবে রেখেছিলাম যে, কাল আমরা চা বাগান ঘুরতে যাব। কিন্তু বাবার ব্যবসার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলে আসায় আর আমরা থাকতে পারলাম না। বাবা আমাদের সন্ধ্যায় কেনাকাটা করতে নিয়ে গেলেন। আমরা অনেক কিছু কিনলাম। বন্ধুদের জন্য চকোলেটও কিনলাম। রাতে আমরা হোটেলের রান্না খেয়েছি। পরদিন সকাল ৬টায় আমরা ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। আসার সময় খুব মন খারাপ হলো। কিন্তু আমার ভ্রমণটা খুব মজা লেগেছিল। অনেক আনন্দ করেছিলাম। এখনও খুব মনে পড়ে আমার সেই ভ্রমণের কথা।

“শতাব্দীর স্মারক লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান

নাফিজা আক্তার
শ্রেণি : দশম, রোল : ১৫
শাখা : (ক), প্রভাতি

ভ্রমণ হলো এক অপূর্ব সুন্দর অভিজ্ঞতা। ভ্রমণ হলো ভ্রমরের মতো ঘুরে বেড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করা। আমাদের এই শস্য শ্যামলার অপরূপ দেশের স্নিগ্ধে আমি বিমোহিত। এই দেশের প্রতিটি সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করে তোলে। মন চায় কবির মতো হারিয়ে যাই প্রকৃতির অপূর্ব স্নিগ্ধরূপে। তাই তো কবি ‘জীবননান্দ দাস’ বলেছেন–

“আবার আসিব ফিরে

ধানসিঁড়িটির তীরে

এই বাংলায়।”

মানুষ সবসময় এক জায়গায় থাকতে ভালোবাসে না। পৃথিবীকে ঘুরে দেখতে চায়। তেমনি আমিও শুধু ঢাকাকে চিনতে চাই না। চিনতে চাই পুরো পৃথিবীকে। পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা রয়েছে যা অসম্ভব সুন্দরতায় আবিষ্ট রয়েছে। কিন্তু আমরা সেসব জায়গা সম্পর্কে জানিও না। তাইতো ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ লিখেছেন–

“বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।

দেশে দেশে কত না নগর রাজধানি।

মানুষের কত কীর্তি, কত নদী, গিরি, সিন্ধু, মরু,

কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু,

রয়ে গেল অগোচরে।”

জে.এস.সি পরীক্ষা শেষে বাসায়ই ছিলাম। আব্বুর কাজের জন্য কোথাও যাওয়া হয়নি। তাই আমিও আমার বুক সেলফ ভর্তি পুরস্কারের বইগুলো পড়া শুরু করলাম। কিন্তু এক সময় সেগুলো সব শেষ হয়ে গেল। তখন আর বাসায় মন টিকছিলনা। এমতাবস্থায় হঠাৎ ২৮ নভেম্বর, ২০১৭ সালে বেলা ১১:৩০ মিনিটে আম্মুর মোবাইলের রিং বেজে উঠল। দেখলাম ছোট খালু লেখা। আম্মুকে দিলাম। খালু নাকি আম্মুকে আমাকে সাথে করে তাদের বাসায় যেতে বলেছে। খালামনির বাসা সিলেটে। সেখানে যাওয়ার কথা শুনে মনে হলো যেন আমি ‘স্বর্গ’ পেয়ে গেছি। দিনক্ষণ ঠিক করে ১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে আমি আর আম্মু ভোর ৫:৩৫ মিনিটে ‘পারাবত এক্সপ্রেসে’ করে সিলেট জেলার মৌলভীবাজার সদরে কমলগঞ্জ স্টেশনে গিয়ে নামলাম। নেমেই দেখি খালু দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে রিকশায় করে বাসায় গেলাম।

তারপর ৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে বেলা ১১টায় আমি, আম্মু, খালু, খালামনি, ছোট ভাই সিয়াম ও ছোট বোন ফাইজা আমরা সবাই সিএনজিতে করে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে গেলাম। মৌলভীবাজার কমলগঞ্জ শহরেই এই উদ্যানে। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। হাঁটতে হবে। কিছুদূর যাওয়ার পরই দেখলাম অনেক উঁচু পাহাড়ে কিছু সজ্জিত পসরা। বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। উঠেই দেখি দোকানের সামনে বাঁশের তৈরি টেবিল-চেয়ার-বেঞ্চ পেতে রেখেছে। প্রথমে চায়ের দোকানে গেলাম। সেখানে 'সাত রঙের চা' বানিয়ে বিক্রি করে। আমি আর আম্মু সাত রঙের আর বাকি সবাই 'পাঁচ রঙের' চা খেলাম। এরপর পাশের দোকান থেকে একটি হাতের কারুকাজ করা ব্যাগ এবং ক্যাপ কিনলাম। সেখানে থেকে নেমে দেখলাম এর ভেতর দিয়ে ট্রেনের রাস্তা। তখন বুঝলাম সিলেটে আসার সময় যখন অনেক অন্ধকার হয়েছিল এবং মনে হয়েছিল যেন উঙ্গোলে ঢুকেছি সেটি এই জায়গায়ই ছিল। কিছুক্ষণ পর সেই রাস্তায় ঢাকা থেকে 'কাকলী এক্সপ্রেস' এলো। তারপর হঠাৎ করে চোখ পড়ল এক অপূর্ব লেখায়। লেখাটি ছিল একটি বোর্ডে। বোর্ডে লেখা হুমায়ুন আহমেদের বিখ্যাত ছবি 'আমার আছে জল'-এর শ্যুটিং স্পট এই লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান। শ্যুটিং সাল : ২০০৮ইং।

প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান : 'ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিঃ'। এরপর আরো সামনে গিয়ে দেখলাম পাহাড়ের ওপর পর্যটকদের জন্য থাকার খুব সুন্দর ব্যবস্থা। চারপাশে বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছ, আরও অনেক গাছ (বিরল প্রজাতি-কাজুবাদাম গাছ)। সেটাও পাহাড়ের উপর ছিল। সেখান থেকে নেমে দেখলাম একটি গেট। গেটের বাইরে বোর্ডে লেখা 'মণিপুরী এলাকা'। ২০০ মাইল হাঁটার পর মণিপুরী এলাকা। পথ ধরে হাঁটা শুরু করলাম। নানা ধরনের বানর দেখলাম। দু'পাশে বন-জঙ্গলের মধ্যে বালুর রাস্তা। জুতো খুলে খালি পায়ে হাঁটা শুরু করলাম। কিছুদূর যাওয়ার পরই দেখি অল্প একটু পানি। কিছু বুঝলাম না। পরে দেখি দূরের এক ঝরণার প্রবাহ থেকে এই পানি এসে জমা হয়েছে। অল্প পানির মধ্যে ছোট ছোট সাদা পাথর। সবাই কাপড় কঁচিয়ে নেমে পড়লাম। পানির নিচে শুধু বালু। কতক্ষণ নেই পানিতে খেললাম। ছবি তুললাম। তারপর আবার হাঁটা শুরু করলাম। রাস্তা দু'পাশে এত ধরনের গাছ। এদের অর্ধেকেরও নাম জানি না। তবে দেখলাম অধিক পান গাছ। পরে শুনলাম আমরা নাকি সেখানকার 'পান মন্ত্রী'র বাড়ি যাচ্ছি। সেখানে পৌঁছে গেলাম। অনেক উঁচু পাহাড়। তার ওপর তাদের বাড়ি। বাঁশ দিয়ে সিঁড়ি করা। উপরে উঠলাম। উঠে দেখি পাহাড়ের উপর আরেক পাহাড়। সেই পাহাড়েও অনেক বসবাস করে। দেখলাম তারা কী পরিষ্কার। তাদের বাড়িঘর একদম ঝকঝকে। প্রত্যেক বাড়ির সামনেই হরেক রকম, রঙিন ফুলের গাছ। তারপর সেখান থেকে নেমে এক দোকান পেলাম। সেখান থেকে কিছু কিনে খেলাম এবং একটু বসে জিরিয়ে নিলাম। মনে মনে ভাবলাম এই গহিন জঙ্গলে পাহাড়ের গায়ে তারা তাদের জীবন কত সুন্দর করে তুলেছে। তাদের কষ্টও অনেক। প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস কিংবা বাজার করতে ২০০ মাইল পথ হেঁটে গিয়ে করতে হয়। এই ভাবনার ব্যাঘাত ঘটল এক আনন্দময়ী রিমঝিম শব্দে। জিজ্ঞাসা করায় সেখানকার লোকেরা বলল, ঝরণার শব্দ। আমি দেখার জন্য পাগলামি শুরু করলাম। তারপর এক লোক আমাদের সেখানে নিয়ে গেল। যত এগোচ্ছি তত শব্দ বাড়ছে আর তত আমার মনে উদ্ভাসিত হচ্ছে। একটু একটু করে যেতেই পৌঁছে গেলাম ঝরণার কাছে। দেখে আমি দুই মিনিটের জন্য থ বনে গিয়েছিলাম। এত সুন্দর দেখতে। উঁচু পাহাড়ের গাঁ বেয়ে অবিরাম নিচে নেমে আসছে। পানি যেই পাহাড়ের গায়ে বারি খাচ্ছে অমনি চারদিকে ছিটকে পড়ছে। আমার গায়েও পানি এসেছিল। তখন আমার মনে হয়েছিল 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে'র লিখিত 'ঝরণার গান' কবিতার কিছু উদ্ভাসিত পঙ্‌ক্তি। তাহলো–

"চপল পায় কেবল ধাই
ঝাঁপিয়ে যাই, লাফিয়ে যাই
দুলিয়ে যাই অচল- ঠাঁট
নাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই–
টিলার গায় ডালিম-ফাট।
থল ঝাঁঝির মখমলে
জরির জাল আং রাখায়–
অঙ্গ মোর ঝলমলে।"

শুধু মন ভরে মুগ্ধ চোখে দেখে নিলাম। কারণ ঝরণা মুগ্ধ চোখ প্রত্যাশা করে। শুনে ভালো লাগল যে, সেখান থেকে কেউ কোনো দরকারের কাজেও পানি নেয় না। যাই হোক ছবি তুললাম সবাই মিলে। ঘড়িতে দেখি ৩টা বেজে গেছে। খালু বলল, এখন আমাদের ফিরতে হবে। তখন মনে ইচ্ছে হলো না এখান থেকে চলে যাওয়ার। মনে হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা–

"যেতে নাহি দিব হায়
তবু যেতে দিতে হয়
তবু চলে যায়।"

ঠিকই এমনই হয়েছিল। আমার যাওয়ার ইচ্ছা নেই। তবু যেতেই হবে। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে রাস্তা দিয়ে এসেছি সেই রাস্তা ধরেই আবার হাঁটা শুরু করলাম। আবার সেই পানি পেলাম। কিন্তু এবার পানিতে নামিনি। মাঝ দিয়ে গাছ রাখা আছে। সেই গাছের উপর দিয়েই পার হলাম। পার হওয়ার সময় এক মজার কাহিনী যা আমার ছোট ভাই সিয়াম হঠাৎ পা স্লিপ করে ধপ করে পড়ে গেল পানিতে। আমরা সবাই উচ্চস্বরে অট্টহাসি হাসলাম। তারপর আম্মু ওকে উঠাল। এরপর আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে সেখানকার নামকরা 'ফাইভ স্টার' হোটেলে খেলাম। তারপর সিএনজি করে বাসায় ফিরলাম।

১১:৩ মিনিটে এই চার ঘণ্টা আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর চার ঘণ্টা। এই সময় আমি কখনো ভুলব না। ভ্রমণ করে মজাই পাওয়া যায় না, অনেক কিছু শেখাও যায়। আমিও শিখেছি। তা সবাইকে একটা কথাই বলব যে, সবাই ভ্রমণ করবে। তবে প্রফুল্লিত হয়ে উঠবে এবং তোমার মন ভালো থাকবে। যেমন আমি থাকি।

অন্যরকম ভ্রমণ অন্যরকম অভিজ্ঞতা

ফারহানা আক্তার
শ্রেণি : দশম, রোল-২৯
শাখা : ক (প্রভাতি)
বিভাগ : বিজ্ঞান

ভ্রমণ মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যার মাধ্যমে মানুষ তার সুখ-শান্তি ফিরে যায়। আমরা জানি 'Travelling is refreshing our sound body and sound mind' পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যে, ভ্রমণ করতে পছন্দ করে না। সকল মানুষ সুযোগ পেলে পরিদর্শন করে এই পৃথিবীর সকল জায়গাকে। পরিবারের মানুষের সাথে সাধারণত বেড়াতে মজা। কিন্তু পরিবারের বাইরে আরেক পরিবার হলো– 'স্কুল পরিবার'। সেখানে সকল শিক্ষকরা মা-বাবার সমান আর বান্ধবীরাতো আছেই। তাদের সকলের সাথে বেড়ানোর মজাই আলাদা। এই অসাধারণ ভ্রমণ হলো পিকনিকের মাধ্যমে। আসলে ১০ বছর অপেক্ষার পর এই দিনের জন্য সকল ছাত্র-ছাত্রীরা প্রস্তুতি নেয়। আমাদের পিকনিক হয়েছিল ২০১৯ সালের মার্চের ২০ তারিখ রোজ বুধবার। সকল ছাত্রীরা প্রস্তুতি নিতে থাকে। আর সকলকে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল সকাল ৭টার মধ্যে। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও সকলের একটি দুঃখ ছিল তাহলো প্রধান শিক্ষিকা আমাদের স্কুল ড্রেস পরে বেড়াতে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রায় সকল ছাত্রীরা অন্য ড্রেস নিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আমাদের ভ্রমণ শুরু হয় সকাল ৭:৪৫ মিনিটের দিকে। আমাদের ছয়টি বাস গিয়েছিল। আমি যেহেতু বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী তাই আমার বরাদ্দ ছিল বাস-০১। আমাদের বাসে ছিলেন আমাদের শ্রেণি শিক্ষক নিলুফার জাহান, ম্যাডাম, নিভা ম্যাডাম, আতাউর স্যার, সেলিম স্যার, রফিক স্যার, এলিজা ম্যাডাম। আর আমরা ছিলাম ৪০ জন ছাত্রী। তারপর আমাদের সকালের নাশতা দেওয়া হলো। আর তারপর নলেন গুড়ের সন্দেশ খাওয়ানো হলো। আর বাসে ওঠার পর আমার মনে হচ্ছিল কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাবিতা– "থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে"।

এই কবিতাটি মনে পড়ার কারণ কেউ আর ঘরে বন্দি থাকতে চায় না বরং সকলে এই জগতের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে চায়। আমাদের বাসে আমরা সকলে মিলে অনেক মজা করলাম। গান গাইলাম, নাচলাম। অবশেষে ১১টায় আমরা পিকনিক স্পটে পৌঁছায়। কিন্তু কোথায় যাব তা কিন্তু আমাদের বলে দেয়া হয়নি? বলা হয়েছিল সেই জায়গাটি আমাদের জন্য সারপ্রাইজ। তারপর গিয়ে দেখলাম উপরে বড় করে লেখা 'আনন্দ পার্ক', সফিপুর, গাজীপুর। ভাবলাম আমাদের একটি পার্কে নিয়ে এসেছে। তারপর সকলে একসাথে ঢুকে গেলাম। তারপর আমাদের প্রভাতি শাখার মেয়েদের জন্য একটি রুম বরাদ্দ ছিল। আর সেখানে সবার অনেক কষ্ট হয়। কারণ রুমটি অনেক ছোট ছিল আর মেয়ে ছিল বেশি। তার থেকেও বড় কথা সেখানে মশা ছিল। আস্তে আস্তে সকল মেয়ে স্কুল ড্রেস ছেড়ে অন্যান্য বিভিন্ন ড্রেস পরতে থাকে। সেই পার্কের আকর্ষণমুখর জিনিস ছিল 'Swimming pull' যেখানে সবাই অনেক মজা করে গোসল করে। তারপর সবাই যখন আমার থেকে আলাদা পোশাকেও তা দেখে আমার অনেক কষ্ট লাগে। তখন ফারজানা ম্যাডাম আমাকে ড্রেসের কথা জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম যে, ম্যাম আমি কোনো আলাদা ড্রেস আনিনি। তখন ম্যাডাম আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ফারহানা মন খারাপ করো না, ভাবো যে তুমি সবার থেকে আলাদা। যা আমার মনকে ভালো করে দেয়। আমার দেখা আমি পরমা প্রিয়ন্তী ও দিবা শাখার মেয়ে আমরা চারজন স্কুল ড্রেস পরেছিলাম। অতঃপর লক্ষ্য করলাম আমার প্রিয় শিক্ষকরা কোথায়? তখন দেখলাম আমাদের সাথে অনেক শিক্ষকই যাননি। যেমন : নাসরিন ম্যাডাম তখন ট্রেনিংয়ে ছিলেন। শিরিন ম্যাডাম অসুস্থ ছিলেন আর নাসরিন ম্যাডামকে আমি যখন বললাম, তখন ম্যাডাম আমাকে বললেন– তোমাদের সাথে যেতে পারলে ভালো লাগতো। আমার মনে হয়েছে সকল শিক্ষক গেলে হয়তো অনেক মজা হতো।

অতঃপর সকলে ঘুরল। আর ২:৩০ মিনিটে আমরা দুপুরের খাবার খেলাম। তারপর ৫টার দিকে বড় ম্যাডাম লটারি শুরু করল। পুরস্কার ছিল ৪০টি। আমিও একটি টিকিট কিনেছিলাম। কিন্তু আমি কোনো পুরস্কার পায়নি। কিন্তু জায়গাটি অনেক সুন্দর ছিল। সবাই থ্রি-ডি মুভি দেখার সুযোগ পেয়েছিল। তারপর আমরা ৬টার পরে বাসে উঠলাম। আমাদের কমলা দেওয়া হলো। আর রফিক স্যার অনেক গান গাইলেন আমাদের সাথে। গানের কলি খেললেন অতঃপর আমরা স্যারকে বলেছিলাম, স্যার আপনি শিক্ষক না হয়ে গায়ক হলে অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করতেন। তখন স্যার অনেক খুশি হলেন। কীভাবে যেন সুন্দর সময় কেটে গেল। আর ফিরে এলাম আবার সেই আপন জায়গায়। কিন্তু এই ভ্রমণ আমাদের সবার মনে অনেক দিন রং তুলিতে ছবির মতো থাকবে।... মানুষ সাধারণত সকল সুখ ও সকল দুখের কথা সারাজীবন মনে রাখে। এই আনন্দময় মুহূর্তকে কোনোদিন ভোলা যাবে না। এই স্মৃতি সারাজীবন মনে ছবির মতো থাকবে। আমি এই ভ্রমণের কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না।